লোক কারুশিল্প মেলা
ও
লোকজ
উৎসব '৯৫

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন

লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৫

১১ই মার্চ থেকে ৯ই এপ্রিল ১৯৯৫

স্মরণিকা

স্মরণিকায় তাদেরকেই স্মরণ করি—
সেই সব লোক শিল্পীদের
যাঁরা মানব জাতির প্রয়োজনে
গড়ে তুলে ছিল অর্থনৈতিক সংস্কৃতি

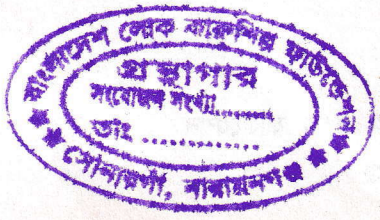

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৫
Folk Art & Crafts Fair and Festival '95

প্রধান সম্পাদক ঃ
বজলুর রহমান ভূঁইয়া
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন

নির্বাহী সম্পাদক ঃ
সৈয়দ মাহবুব আলম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন

সহযোগী সম্পাদক ঃ
রবিউল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত গবেষণা অফিসার

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ
জসিম উদ্দিন
প্রদর্শন অফিসার
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন

ফটোগ্রাফী ঃ
মোঃ সফিকুর রহমান
ফটোগ্রাফার
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন

প্রকাশনায় ঃ
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
৮ই মার্চ, ১৯৯৫ ইং

মুদ্রণ ঃ
এশিয়াটিক সিভিল মিলিটারী প্রেস
৪৩/১০ সি, স্বামীবাগ, ঢাকা

বাণী

আবহমান বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ঐতিহ্যবাহী চারু ও কারুশিল্পের প্রবহমান ধারা বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে প্রতিনিয়ত উজ্জীবিত করছে। বৈশিষ্ট্যময় করেছে, বিশ্বের সংস্কৃতির ভাণ্ডারে। কিরূপে, কি গড়নে, কি রঙ্গে, জীবনের প্রাত্যহিকতাকে, আত্মজিজ্ঞাসার সকল প্রবহমানতাকে অবলীলাক্রমে ধারণ করে আছে আমাদের লোক ও কারুশিল্প। বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দেশের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য তথা জাতীয় স্বাতন্ত্রের সকল বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে লোক ও কারুশিল্প।

জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ লোক ও কারুশিল্পের উন্নয়ন, পুনরুজ্জীবন এবং রূপান্তরে লোকমেলা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অর্থাৎ লোকমেলা লোক ও কারুশিল্পের প্রসারে কার্যকর ক্ষেত্র ও আয়োজন। এই প্রেক্ষিতে দেশের লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনে নিয়োজিত বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন প্রতিবছরের মত এবারও এক মাস ব্যাপী লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের আয়োজন করছে এবং এই উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে যেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

আমি লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৫ এর সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করছি। আমার আন্তরিক বিশ্বাস যে এই লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উজ্জীবনী শক্তির প্রবহমান ধারার সংগে মিলনের ও মেলাবার সুযোগ সৃষ্টিতে সক্ষম হবে।

ড. জাহানারা বেগম

(অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম)
প্রতিমন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাণী

দেশের সংস্কৃতির রূপকার এদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ গ্রামের সাধারণ মানুষ। গ্রামের সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি– লোক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য লোক ও কারুশিল্পে নিহিত। জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভাণ্ডার লোক ও কারুশিল্প। লোক ও কারুশিল্প তথা লোকশিল্পী ও কারুশিল্পীদের উৎসাহ ও পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন প্রতি বছরের মত এবারও এক মাস ব্যাপী লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজউৎসব '৯৫ আয়োজন করছে এবং এই উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এই প্রচেষ্টাকে আমি আন্তরিক ও শুভ উদ্যোগ বলে মনে করি। এ উদ্যোগের সংগে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি মোবারকবাদ।

আমি এই লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম
জাতীয় সংসদ সদস্য

বাণী

আমাদের জীবনে, সংস্কৃতির সকল কর্মকাণ্ডে লোক সংস্কৃতি চলমান নদীর স্রোতধারার মতই সজীব। লোক সংস্কৃতির ধারায় রয়েছে লোক কারুশিল্প ও লোকজ উৎসবের অনিবার্য উপস্থিতি। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোক মেলায় লোক সংস্কৃতির ভাণ্ডার–লোক কারুশিল্প ও লোকজ উৎসবের সমাহার ঘটে থাকে।

বাংলাদেশের লোককারুশিল্পের ও লোকজ উৎসবের সমাহার ঘটাতে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন প্রতি বছরের মত এবছরও লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৫ আয়োজন করছে এবং এই উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশ করছে যেনে আমি আনন্দিত। এই উদ্যোগ দেশের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি এই লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৫ সার্থক এবং সফল হোক এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

(মোঃ মোখলেসুর রহমান)
সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

লোক ঐতিহ্যের বিস্তার ঃ রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের এক শক্তিশালী যোগাযোগ মাধ্যম।

বজলুর রহমান ভূঁইয়া
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন।

লোক ঐতিহ্যের বিস্তার পৃথিবীর সবদেশই চায়। আমাদের দেশও চায়। আর এই লোক ঐতিহ্যের বিস্তারের প্রতিফলন সাধারণত নিখুত এবং বিপুল সম্ভারে পরিদৃশ্য হয় দেশের আনাচে কানাচে আবহমান কাল ধরে বসা লোক মেলায়। লোকমেলার আরম্ভকাল বহু আগের, অর্থাৎ প্রাচীনতম কাল থেকেই; অর্থাৎ এশীয়, মিশরীয়, গ্রীক ও রোমান সভ্যতা থেকে শুরু করে আজতক এই আধুনিক কালেও এর পরিধি বিস্তৃত। সুতরাং মেলার লোক সংস্কৃতির ইতিহাস প্রাচীন।

আর এ মেলায় সাধারণত কি হয় আর কি হতে পারে। মেলার ইতিহাস এবং এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা বিশ্লেষণ করলে উপলব্ধি করা যায় প্রাচীনকালে থেকে এখন পর্যন্ত লোক মেলা বয়ে নিয়ে আসছে ধর্মীয় চেতনার উদ্বুদ্ধতা, আনন্দে উদ্ভাসিত ঝলমলে ধারা আর বাস্তব আর্থিক প্রয়োজনের অর্থ সংস্কৃতি। "The methods of commerce introduced of fairs became widespread and rules of the fair eventually became the basis of business law. As commerce began to flourish the great fairs became increasingly important" E. Britanica) " লোকমেলার উপলব্ধির ধারাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা মনস্তাত্তিকভাবে তিনটি জিনিস পাই, এক, ভাব, দুই উচ্ছাস এবং তিন, প্রয়োজন-ভাবের আদান প্রদান মানুষের চিন্তার পরিধিকে-নানা শাখা প্রশাখাকে বিস্তারিতভাবে বিস্তৃত করে। হৃদয়ের উচ্ছসিত আনন্দের আদান প্রদানের ধারা মনে জোগায় একটা নতুন এনার্জি। আর জীবনের অস্তিত্বের আর্থিক প্রয়োজনের লেনদেন আনে কর্মের গতি। মূলতঃ সভ্যতার উৎকর্ষের মনস্তাত্ত্বিক তিনটি মৌল উপাদানই হলো ভাব, আনন্দ এবং কর্ম। কারণ তিনটি ধারাই মানুষ মানুষের যোগাযোগ মাধ্যম তৈরী করে। প্লোটো বলেছেন, Communication is winning of men's mind. অর্থাৎ মানুষের হৃদয় জয় করার প্রক্রিয়াকেই প্লেটো 'যোগাযোগ' বলতে চেয়েছেন। বর্তমান দিনে উন্নয়ন যোগাযোগে এর চেয়ে সত্য আর কি হতে পারে?

মানুষের মনের মধ্যে বাসা বাধাই হলো যে কোন কার্যসিদ্ধির মৌলিক প্রথম কাজ। এটা সম্ভব করতে পারলে উন্নয়নে জনগনের পূর্ন অংশগ্রহণ নিশ্চিতভাবে সম্ভব। জনগণের এই অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে সেই প্রাচীনকাল থেকে আজকের আধুনিক প্রযুক্তির যুগেও বহু যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তার মধ্যে অন্যতম প্রধানই হচ্ছে লোকজ মাধ্যম।

বর্তমান দুনিয়ায় শুধু উন্নত দেশ সমূহেও নয়, অনুন্নত, অর্ধ উন্নত এবং উন্নয়নকামী দেশ সমূহেরও উন্নয়ন যোগাযোগের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে লোকজ মাধ্যম। লোকজ মাধ্যম হচ্ছে সেই মাধ্যম, যা চিরায়ত, হাজার বছরের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ এবং যার বসতি হচ্ছে সাধারণ জনগণের মনে।

এটা অনস্বীকার্য নয় যে বর্তমান যুগ ইলেকট্রেনিকের যুগ। লোকজ মাধ্যম অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দুনিয়া ইলেকট্রোনিকস গনমাধ্যমের পরিপূরক হিসাবে শুধু নয়, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে গনযোগাযোগে প্রধান হাতিয়ার হিসাবে স্বীকৃত এবং একটা অধিক ফলদায়ক ও দ্রুত সহৃদয় হৃদয় সংবেদী মাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

আর লোকজ মাধ্যম উৎকৃষ্টভাবে বাস্তব প্রয়োগ হতে পারে লোক মেলার সংস্কৃতির অঙ্গনে। সেখানেই রুপান্তরিত হতে পারে ভাব, আনন্দ আর কর্মের চিত্রবিচিত্র গতি ধারা। সভ্যতা সৃষ্টির মুল উৎপত্তির তাৎপর্য সেখানে থেকে সৃষ্টি।

সুতরাং যতবেশী লোকজ মাধ্যম ব্যবহৃত হবে, ততবেশীলোক ঐতিহ্যের বিস্তার ঘটবে। কারণ রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের মনে বসতি হয়ে আছে-হাজার হাজার বছরের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। ফলে মানুষ দ্রুত সহৃদয় হৃদয় সংবেদী হয়ে উঠবে, বলিষ্ঠভাবে সে হবে স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ। আর এই বোধটাই আমাদের রাষ্ট্রের উন্নয়নে বড় বেশী প্রয়োজন এখন।

আদিম মানুষ গুহা গাত্রে চিত্র একে যেতো যোগাযোগের উদ্দেশ্যে। গণযোগাযোগের লোকজ মাধ্যমের উদ্ভব এখান

থেকেই। বিভিন্ন মানুষ তাদের তথ্য প্রচার এবং এর থেকে আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করতো। সেদিন থেকে লোকজ মাধ্যমের এই আদিম কৌশল হচ্ছে সকল প্রকার গণযোগাযোগের মৌলিক মাধ্যম। যুগে যুগে এর রূপান্তর ঘটেছে। কন্তু এর গুরুত্ব কমেনি এতটুকু।

বাংলাদেশ একটি ঐতিহ্যশালী এবং হাজার বছরের প্রাচীন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের দেশ। এ দেশের অকৃত্রিম সংস্কৃতি জগৎ একটি শক্তিশালী গনমাধ্যম হাতিয়ার। বাংলাদেশের সংস্কৃতির লোকজ ধারাই হলো সেই গণমানুষের সংস্কৃতি। সুতরাং বাংলাদেশের কবিগান, সারীগান, জারীগান, বিচার গান, গম্ভীরা গান, পালাগান, পুঁথি পাঠ, পুতুল নাচ, পটচিত্র, ভোজ বাজি, সং সাজা, মেলা ইত্যাদি হলো আদি অকৃত্রিম লোকজ ধারা। রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে এ ধারা এবং এর বিস্তার অকৃত্রিম শক্তিশালী ভূমিকা নিতে পারে। এতে উপস্থিত সমগ্র গ্রামবাসী এবং সাধারণ মানুষ দেশ গঠনে তাদের ভুমিকার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠবে, কাজকর্মে জনমত গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, অংশীদারিত্বের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রভাবিত ও সুকৌশলী হবে, আর হবে স্বনির্ভরতা দর্শনে মথিত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে লোকজ ধারার প্রয়োগ এবং ঐতিহ্যের বিস্তার রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে এক বিরাট শক্তিশালী যোগাযোগ মাধ্যম হতে পারে। শ্লোগান হতে পারে তাই– "লোক ঐতিহ্যের বিস্তারই হোক দেশের উন্নয়নের এক শক্তিশালী যোগাযোগ মাধ্যম।" ❑

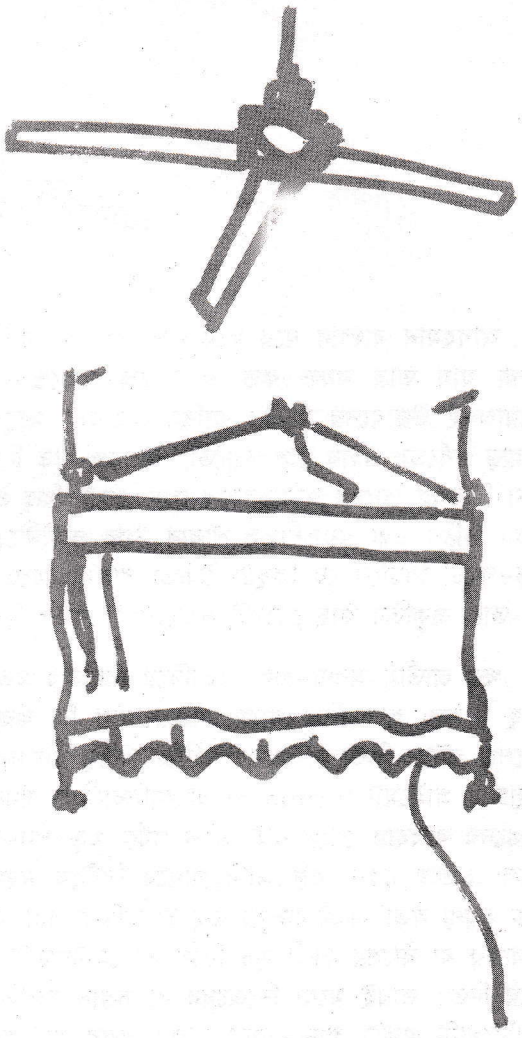

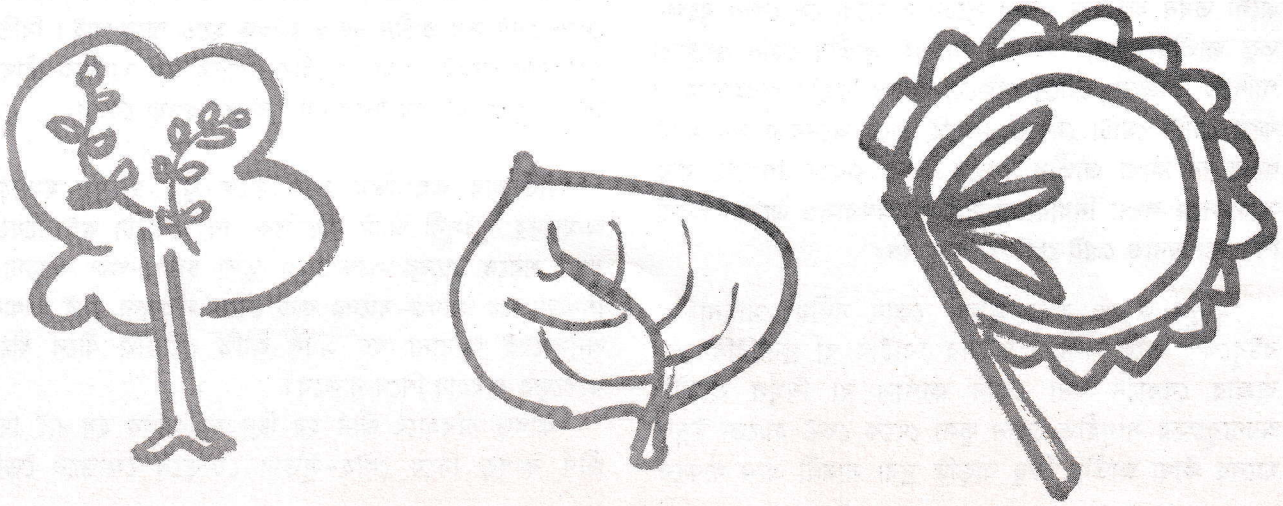

নকসী কাঁথা

ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী

আবহমান বাংলার ঘরে ঘরে আজ যেসব নকসী কাঁথা দেখা যায় তার বয়স কত এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। প্রয়োজনই উদ্ভাবনের মাতা। আদিম গুহাচারী মানুষ যখন পাহাড় পর্বতের গুহায় বাস করতো, নিদারুণ শীত নিবারনের জন্য নিশ্চয়ই তাদের গাত্রাবরণের জন্য একটা কিছু প্রয়োজন হত। কঠিন এবং বরফশীতল শীলার উপর পক্ষীনীড়ের মত খড়-কুটো বিছালে যে কিছুটা উষ্ণতা পাওয়া যেতে পারে, তা তারা প্রকৃতির কাছ থেকেই সম্ভবতঃ শিখেছিল নিশ্চয়।

খড় জাতীয় অরণ্য-গুল্ম-লতাদিয়ে বিছানার মত একটা কিছু না হয় হ'ল কিন্তু গায়ে দেয়ার জন্য কি করা যায়? বিশেষ করে শিশুদের জন্য। বিজ্ঞ নৃতত্ত্ববিদদের মতে গুহাচারী প্রাইমেট (Primate) বা আদিবাসীগণ যখন পর্যন্ত আগুনের ব্যবহার শেখে নাই তখন পর্যন্ত খড়-শন-তৃণ বা বল্কল জাতীয় কোন বস্তু আদি পাথরে পিটিয়ে নরম করে শক্ত অরণ্য লতা বা জীবজন্তুর তন্তু বা ভক্ষিত রগশিরা কোন পাথরের বা বাঁশের তৈরী সূচ দিয়ে তা মোটামোটি সেলাই করে নিত। তারই মধ্যে নিজেদের বা সন্তান সন্ততির জন্য মোটামোটি একটা শয়ন-শয্যা হ'ল। প্রস্তর যুগ পার হয়ে আরও বহু পরে মানুষ ধীরে ধীরে যখন তাম্র-লৌহ যুগে এলো তখন বড় বড় ধাতব সূচের সাহায্যে সে কোন বৃক্ষের তন্তু জাতীয় বল্কল, শন পাট বা এই জাতীয় কোন গুল্মলতা পানিতে ভিজিয়ে, রৌদ্রে শুকিয়ে, আরও কিছুটা ব্যবহারযোগ্য করে মোটা মোটা ফোঁড়ে সেলাই করে অনেকটা সাদামাটা আমাদের কাঁথা জাতীয় বস্তুতে তৈরী করতে শিখলো যার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা নিবারণের সংক্ষিপ্ত অঙ্গবাসও এলো। এলো শিশুদের জন্যও ছোট ছোট আবরণ খণ্ড।

মানুষ আরও সভ্য হ'ল। কোন নদীর মোহনা বা বটবৃক্ষের তলে বসলো তাদের 'বার্টার বা দ্রব্যবিনিময়ের বাজার যেখানে বন্য কোন কার্পাস বা শিমুল জাতীয় অরণ্যবৃক্ষের সংগৃহীত কোন তুলা থেকে কেউ হয়তো উন্নত মানের কাঁথা জাতীয় কিছু বাড়তি দ্রব্য সামগ্রী এনে থাকবে বিনিময়ের জন্য। নৃতত্ত্বের সেই ত্রয়ী ধারা 'বরোইং' বা ঋন, 'অ্যাকালচারেশন' বা সাঙ্গীকরণ এবং ইনোভেশন বা নব-উদ্ভাবনের প্রক্রিয়ায় শুরু হ'ল আরও উন্নত জাতের কাঁথা জাতীয় শিল্পের অগ্রগতি। কালিদাসের শকুন্তলা কাহিনীতে আমরা নায়িকাদেরওত 'বল্কল' পরিধান করতে দেখি। বল্কল পরিহিতা এমন সুন্দরী সকুন্তলাকে দেখেইত রাজা দুষ্মন্তের চোখ আটকে যায়। আর্য সভ্যতার আগমনের পূর্বেও আর্যেতর জাতি এবং দ্রাবিড়গণ খ্রীঃপূর্ব ৩০০০ অব্দেও বস্ত্রের ব্যবহার জানতো। তাদের গাঁথা, কথা ও উপকথায়ও তার বিবরণ পাওয়া যায়। রূপকথার 'ম্যাজিক কাঁথার' সে বিবরণ ত বহু গল্পেই আছে। বহু জাতির মিলন ভূমি এই বাংলাদেশে বহু রিচুয়াল, পাল-পার্বন-ব্রত-পূজা-অর্চনা-ইত্যাদিতে অনার্য-গন যেমন আর্যদের কাছে ঋণী, আর্যগনও নিয়েছে তাদের কাছে থেকে প্রচুর। সাধারণ শীত নিবারণের জন্য প্রয়োজনে যার উদ্ভাবন, পরবর্তীকালে কন্যার বিবাহ, উৎসব, ধর্মানুষ্ঠান, টাবু, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি সব কিছুকে ঘিরে প্রবাহিত হয়েছে নকসী কাঁথার বিচিত্র মটিফ। যদিও তার বিবরণ আজ প্রাচীন গাঁথা গীতিকাতেই পাওয়া যায় মাত্র। দেখা যায় হয়তো কোন প্রাচীন গুহাচিত্রে অথবা অজন্তা ইলোরার মন্দির গাত্রে। আমাদের পানির দেশে বানভাসির দেশে সেই সব প্রাচীন দৃষ্টান্ত রক্ষিত হতে পারে নাই। বিভিন্ন রূপকথার গল্পেই আমরা পূর্বোক্ত বিচিত্র সব ম্যাজিক কাঁথার বিবরণ দেখি যা গায় দিলে নাকি অদৃশ্য হওয়া যেত।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ঝুম চাষের মাধ্যমে আমাদের পূর্বসূরী আদি অস্ত্রালিক গণ (প্রোটো অস্টালয়েড) ধান, শরষে চাষের সঙ্গে সঙ্গে তুলা চাষও শুরু করলো-শিখলো বস্ত্র বয়ণও-যাদের কাছ থেকে নৃতত্ত্বের সেই ত্রিধারা অনুসারেই অন্যান্য বহু আদি জাতি গোষ্ঠীও ধীরে ধীরে কাপড়ের ব্যবহার শিখে থাকবে।

কাপড় ব্যবহারে জীর্ন হয় ছিন্ন হয় মলিন হয় এই ছিন্ন জীর্ণ কাপড় দিয়ে লৌহ-সূতার ফোড়নে ফোড়নে তৈরী

হ'তে লাগলা কাঁথা জাতীয় বস্তু-বিশেষ করে শিশুদের ব্যবহারের জন্য। বাংলাদেশে আমরা নিম্নে উল্লিখিত জাতের কাঁথা গুলি সাধারণত; দেখতে পাই ঃ

(১) সুজনি কাঁথা ঃ বিছানায় বিছাবার পাতলা কাঁথা;

(২) মোটা কাঁথা ঃ লেপ জাতীয় শীতে গায় দেবার জন্য কাঁথা;

(৩) শিশুর জন্য কাঁথা ঃ বিছানায় ও গায়ে দেবার কাঁথা;

(৪) জায়নামাজ ঃ পূজা আর্চার জন্য কাঁথা ঃ নামাজ পড়া বা পূজার সময় আচার্যের জন্য কাঁথা;

(৫) আসন কাঁথা ঃ মিলাদ মাহফিলে বা পূজা-আর্চায়ে আচার্যের বসার জন্য কাঁথা ;

(৬) দস্তর খান ঃ পাটি বা ফরাসে খাবার সময় বিছানোর জন্য কাঁথা;

(৭) পালকি, ডুলি বা নৌকার ছইতে পর্দাস্বরূপ কাঁথা;

(৮) ঘোড়ার গদির উপর ব্যবহারের জন্য বা চেয়ারে, টেবিলে আচ্ছাদনের জন্য কাঁথা ইত্যাদি।

কাঁথার প্রথম যুগে তা সম্ভবতঃ সাধারণই ছিল-সাদা মাটা কারুকার্যহীন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাতে এলো বৃক্ষ, হংস, চাঁদ ও সূর্য, তারা, মাছ, হাতি, আয়না, চিরুনী, স্বস্তিকা, পান পাতা, এমনকি চড়কা বা গৃহস্থালীর অন্যান্য বস্তু। আরও পরে প্রাচীন খেলাধূলা, উৎসব-উপাচার, কারবালার ময়দান, দূলদুল ঘোড়া, ইন্দ্রের উচ্চে মন্ত্র বা পরী লক্ষ্মীর ঝাঁপি, সংসারের কুলো, ফুল-ফসল, কখনো চতুস্কোন, ত্রিভূজ, গোলাকার, সমান্তরাল, লম্বমান, কত মাপে, ছাচে রঙে ঢঙে চিত্রিত-মাতৃস্নেহের করুণ রসে ধন্য।

এই কাঁথার শিল্পীগণ কোন স্কুল কলেজে এসব শিখে না বাড়ীর বর্ষিয়ান নানী, দাদী, কোন মুরুব্বী স্থানীয় বিশেষ করে মায়ের কাছ থেকেই শিখে থাকে। পুরাতন কাপড়ে বিচিত্র পাড়ের রঙীন সূতা, ছোটবড় কিছু সূচ, সামান্য কাঠ-কয়লা, কোন গাছেররস থেকে সংগৃহীত রঙ-যা দিয়ে আকা হয় চারদিকের বর্ডার, কোন জীবজন্ত বা বৃক্ষলতা বা পূর্বোক্ত গৃহস্থালী সামগ্রীক চিত্র যা ছিল পরিত্যাজ্য, নগন্য তাই হ'ল পবিত্র আর্ট। যা সাধারণ সংগৃহীত সূতার ফোঁড়ে ফোঁড়ে তোলে বিচিত্র চিত্র বা নকসা।

পূর্বকালে কৃষি ভিত্তিক সমাজে বিবাহ যোগ্য কনের অন্যান্য গৃহস্থালীর গুণের সঙ্গে কাঁথা সেলাইও একটি অন্যতম গুণ বলে বিবেচিত হত। ময়মনসিংহের মহিলা কবি চন্দ্রাবতী তার রামায়ন কাব্যে সীতার অন্যান্য গুণের সঙ্গে 'কন্থা' সেলাইয়ে তার পারদর্শিতার কথাও বলেছেন।

সীতার গুণের কথা কি কহিব আর। . . .
কন্থায় আকিল কন্যা চান্ সূরুয পাহাড়।।
আরও যে আকিল কন্যা হাসা আর হাঁসি।
চাইরো পাড়ে আকে কন্যা পুষ্প রাশি রাশি।।

আমরা বিভিন্ন মঙ্গল এবং পুঁথি কাব্যেও রাজ কন্যা, বনিক কন্যাগণ ও সাধারণ সমাজেও নারীদের নক্সী কাঁথা রচনার বর্ণনা পাই। অজস্র মেয়েলী ছড়া ও গীতেও আমরা কাঁথার বর্ণনা দেখি বিশেষ করে নতুন শিশুকে নিয়ে। যে নতুন শিশু পৃথিবীতে এলো তার জন্যওত চাই কাঁথা ঃ

আধ অঙ্গ পাইছিল মায়ের শুয়ে আর সুত।
আধ অঙ্গ পাইছিল মায়ের মাঘ মাইস্যা শীতে।।
নিজের অঙ্গের কাঁথা খানি যাদুর অঙ্গে দিয়া।
সারা নিশি গোয়াইল মায় জাগিয়া বসিয়া।।

শিশু ভাইটি বড় হচ্ছে। স্নেহ ময়ী বোন কাঁথা সেলাই করে তাতে সূতার আঁখরে লেখে ঃ

সোনামনি ভাই আমার সুখে নিদ্রা যাইও।
অভাগিনী বুবুর কথা নিরলে ভাবিও।।

বুবু অভাগিনী কেন? তার কি সংসারে সুখ ছিল না? সে কি স্বামী হারা?

অথবা কাঁথা সেলাতে সেলাতে কন্যাটি পরিশ্রান্ত-গভীর রাত-চোখ ঢুলু ঢুলু ঃ

কাঁথা না বিছাইয়া, কাঁথা না খুলিয়ারে।
ছবি না তুলিতে গো, ঘুমে কাতর হইল নারে।। . . .

তারপর আসে নারীর আকাঙ্খিত সেই শুভদিন-শুভ বিবাহ যে কন্যার নাম হয়তো বালি ঃ

ঢোল করতালের তালে তালে।
কন্যা সাজাই আমরা বালিরে সাজাইগো।
পাহতকুলা লইয়া আমরা বালিরে বসাইগো।
সেই না মায়ের ঝিল মিল নক্সী না কাঁথায় গো।
সেই যে আরসি লতা না কাঁথায় গো।।

অথবা সুপরিচিত রূপবান কন্যার কাহিনীর একটি অংশও কাঁথায় এসে যায় বাঘের ছবি সহ ঃ

দাদু আইছেন বিয়ার ঘটক হইয়া গো।
ও রূপবান, কবুল কর তুমি গো
জামাই আসছে
কি বর কইন্যার মাগো বিছানায় বসিয়া নারে।
আইস্‌তেছে বিবির দামান ফুল
পাগড়ি উড়াইয়া নারে।।
আসুক আসুক বেটির দামান কিছুর চিন্তা নাইরে।
দরজায় বিছায়া থুইছি জামাই-সোহাগ কাঁথা নারে।
শঙ্খলতা কাঁথা নারে।।

সে সব কাঁথা কেমন? সে—কি ভবিষ্যতেরই সুখ মিলন চিত্র?

সেই না কাঁথায় লিইখ্যা থইছে
হাসাহাসির জোড়াগো।
সেই না কাঁথায় লেইখ্যা থইছে
ময়ুর পংখীর জোড়াগো।।
এই কাঁথা কাঁথা নয়রে আরও কাঁথা আছে।
সেই কঁথার মধ্যে মধ্যে বুটি তোলা গেছে।
ময়মনসিংহ গীতিকার কাজল রেখা পালায় পাই ঃ
সমুদ্র সাগর আঁকে-চাঁদ সুরুযে।
ভাঙা মন্দির আঁকে কন্যা জঙ্গলার মাঝে।
মেজেতে শুইয়া আছে মরা সে কুমার।
সূচ রাজার ছবি আঁকে পাত্র-মিত্র লইয়া।
নিজেরে না আঁকে কন্যা রাখে ভাড়াইয়া।

এ যুগের কবি জসিম উদ্দীন তার নক্‌সী কাঁথার মাঠে আকেঁন ঃ

এই কাঁথা যবে আরম্ভ করে তখন সে একদিন।
কৃষানীর ঘরে আদরিনী মেয়ে সারা গায়ে সুখচি না।
স্বামী বসেতার বাঁশী বাজায়েছে
সেলাই করেছে সে যে।
গুণ্ গুণ্ বার গান কভু রাঙাবৌটেতে উঠেছে বেজে।

অথবা বিবাহ হয়ে গেছে স্বামী সেহিাগিনী স্ত্রী ঃ

সেই না কাঁথায় আঁইকা থইছে
কত রঙের ঘোড়াগো।
পশু পংখীর জোড়াগো।
কাঁথা না বিছাইয়া, কাঁথা না সেলাইয়া,
ভাবুইন কন্যা প্রাণ বন্ধুর কথাগো।

অন্য একটি গীতে পাই ঃ

আইসাছে বেটির দামান ওইনা দরজায়রে।
আসুক আসুক বেটির দামান
কিছুর চিন্তা নাইরে।
বাইর বাড়ী বিছাইয়া থুইছি
আরশিলতা কাঁথা নারে . . . ।
কামরাঙ্গা কাঁথানারে . . . ।।

স্বামী বিদেশে আছেন মেঘদুত হয়েযেন চলে যায় তার কাছে প্রোষিতভতৃকাস্ত্রীর কাঁথা যাতে পাখী আকাঃ

যাও পাখী বলো তারে।
সে যেন ভূলে না মোরে।

অথবা

উইড়া যায়রে হংস পংখী
পইড়া রয় তার ছায়া।
দেশের মানুষ বিদেশ গেলে
কে করে তার মায়া।।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ শাড়ী, ধূতি বা চাদরের উপরে পাড়ের সাধারণ সুতোয় যুগে যুগে যে অপূর্ব কারুকার্য ফুটে উঠতো, তা একান্তই এদেশীয়। তারা এসব হাটে বাজারে বিক্রয়ের জন্য তৈরী করতেন না। একটি কিশোরী কন্যা। তাকে তার মা, দাদী বা নানী স্থানীয়া কেউ কাঁথা তৈরী শিখাচ্ছে। কাজ কর্মের অবসরে সে হয়তো ধীরে সুস্থে তা সেলাই করছে। তাতে এঁকে দিচ্ছে কেউ ফুল-লতা বা অন্য কিছু। তার উপর চিকন সূইয়ে সে ছবি তুলছে। অথবা একটি মেয়ের বিয়ে হ'ল। স্বামী গৃহে গিয়ে সে একটি কাঁথা সেলাই শুরু করলো। একে একে সংসারে এলো পুত্র কন্যা। সেই ছোট মেয়েটিরও একদিন বিয়ের বয়স হলো। সংসারে এর মধ্যে এসেছে হয়তো কত দুর্দৈব। কাঁথাটি একদিন শেষ হ'ল। সেই কাঁথা চলে গেল কন্যাটির সঙ্গে যৌতুক হয়ে। এই

ধারা চলতে থাকে কাঁথাও তৈরী হ'তে থাকে ও যুগের পরিবর্তন হয়-তাতেও আঁকা হয় মোটরগাড়ী বা উড়োজাহাজ একাত্তরের কোন মর্মন্তুদ চিত্র বা বানভাসির কোন ছবি।

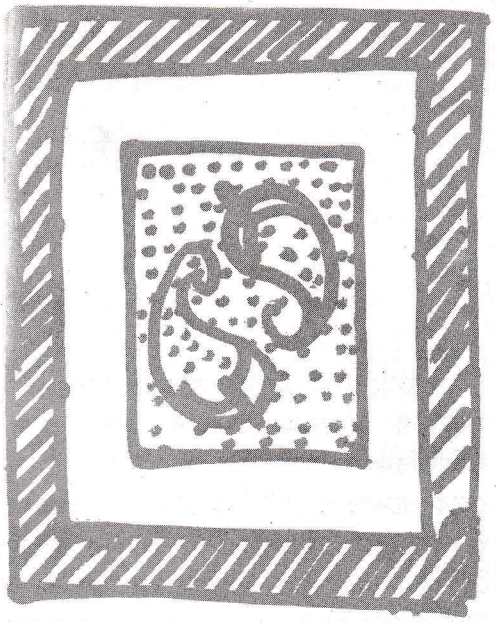

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে-সব বিচিত্র কাঁথা তৈরী হ'ত তার সংগ্রহ আমাদের কাছে খুব বেশী নেই। যা আছে তাতে আবহমান সনাতন বাংলারই চিত্র দেখেছি আমরা।

নক্সী কাঁথা এখন বিসিক, কারিকা প্রভৃতি অনেক প্রতিষ্ঠানই বাণিজ্যিকভাবে তৈরী করছেন দেশ-বিদেশে তার বাজারও আছে। এসব কাঁথায় আমরা যে মটিফ দেখছি তাতে আবহমান বাঙলার রূপটিও ফুটে উঠেছে বহু ক্ষেত্রেই। আমাদের সাবধান হতে হবে, নতুন কিছু করার উদ্যমে আমরা যেন আমাদের ঐতিহ্যকে ভূলে না যাই। গ্রাম বাংলার বিচিত্র উৎসব অনুষ্ঠান, মেলা, পাল, পার্বন, তার জীবন, বিবাহ, বিবাহ যাত্রা, শিশুর জন্ম, আবহমান ঘোড়-দৌড়, নৌকা বাইচ, লাঠি খেলা, মুড়গীর লড়াই, চাষীদের দৈনন্দিন জীবন, বাউল, বৈষ্ণব, বিভিন্ন বিচিত্র গ্রামীন মেলা, গ্রামীন উৎসব, ফসল বপন, ফসল কাটা, গল্প কথা-জারী-সারি-কবির আসর, ঐতিহাসিক কোন যুদ্ধ বা ঘটনার চিত্র, কোন পুঁথি, গাঁথা, কিংবদন্তী বা লোক কাহিনীর মটিফ সবই জানা যাবে বিস্তৃত গবেষণা ও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এবং তা যেন হয় কবির সেই সোনার বাংলারই চিত্র 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালো বাসি। চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাসি।। . . ." ❑

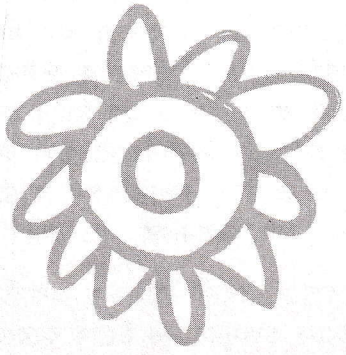

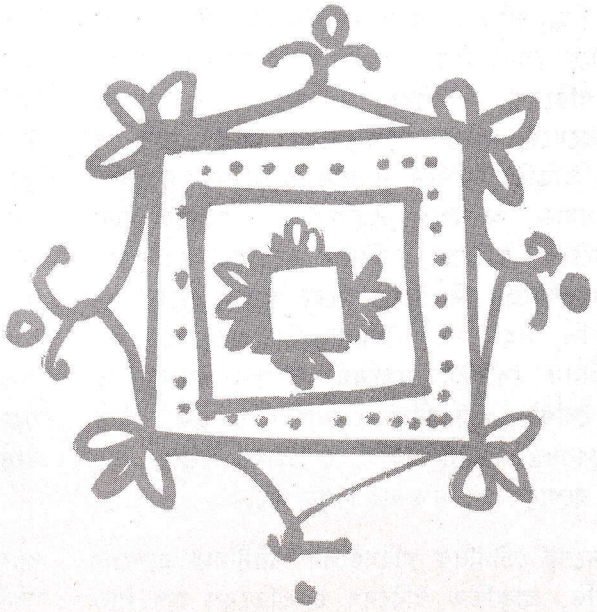

লোক ও কারুশিল্প ঃ প্রসঙ্গ সোনারগাঁয়ের চিত্রিত কাঠের খেলনা ও পুতুল

সৈয়দ মাহবুব আলম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন

বাংলাদেশের গ্রামের সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি-লোক সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হলো লোক কারুশিল্প। কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের লোক সমাজেই আবহমান কাল থেকে এদেশে গড়ে উঠেছে চমৎকার বৈশিষ্ট্যময় গ্রামীন লোক ও কারুশিল্প। বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতির স্বাতন্ত্রের বৈশিষ্ট সমৃদ্ধ এই ঐতিহ্যময় লোক ও কারুশিল্প। বাংলাদেশের গ্রামীন লোক সমাজের সাধারণ মানুষের সৃষ্টি এই লোক ও কারুশিল্প। আরো বিস্তৃত অথচ সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, আবহমান বাংলার লোক সমাজের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন, ধর্ম বিশ্বাস, লৌকিক আচার-আচরণ এবং উৎসবকে কেন্দ্র করে যে চারু ও কারুশিল্প সৃষ্টি হয়েছে তা-ই লোক ও কারুশিল্প। আবহমান বাংলাদেশের সংস্কৃতির পরিচয় মিলবে এই লোক ও কারুশিল্পের রূপে, বিষয়বস্তুতে এবং বৈশিষ্ট্যে।

কেবল শিল্প সৃষ্টিই লোক ও কারুশিল্পের সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়, এর সঙ্গে লোক শিল্পের শিল্পী, কারিগরের চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রতিবেশ, জীবনাচার, ও লোকজ বিশ্বাসের রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ফলে লোক ও কারুশিল্পের প্রতিটি নিদর্শনে বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রতিবেশ, সমাজ, অর্থনীতি, প্রযুক্তির ছাপ পড়েছে নানা ভাবে-বৈশিষ্ট্যের, স্বাতন্ত্রের দাবিদার হয়েছে। এ ছাড়াও লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শনের মধ্যে আমরা খুজে পাব বাংলার প্রকৃতি, সহজ লভ্য উপাদান-কাঁচামাল, সামাজিক গঠন, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, সময়ের, কালের ব্যবধানগত তারতম্যের বৈশিষ্ট্য, পৌরানিক ও লৌকিক কাহিনী, ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য, কিংবদন্তী, নানা নকশা, বৈচিত্রময় গড়ণ, বর্ণ, প্রযুক্তি এবং বংশানুক্রমিক দক্ষতার নিপুন পরিচয়।

বাংলাদেশের ভৌগলিক পরিমণ্ডলের পরিসীমায় এদেশের গ্রামের প্রকৃতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ রূপ লাভ করেছে। মৌসুমী বায়ু, বৃষ্টি, বর্ষা ও নদনদীর দেশ বাংলাদেশ। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে কাঁদা মাটি, বাঁশ, বেত, কাঠ, ঘাস সহজলভ্য উপাদান। এসব উপাদানই বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের উদ্ভব ও সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে, বৈশিষ্ট্য নিরুপণে সহায়ক হয়েছে।

বাংলাদেশের সহজলভ্য প্রাকৃতিক উপকরণসমূহের মধ্যে কাঠ অন্যতম। কাঠ বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের কাঁচামাল বা উপকরণ হয়েছে অনিবার্যভাবে। অতিসহজলভ্য আম, কাঠাল, শিমুল ছাতিম, নিম গাছ দিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষ উপযোগিতামূলক, ধর্মীয়, শিশুতোষ, শিক্ষামূলক কাজে, গৃহনির্মাণ সহ নানা ধরণের লোক ও কারুশিল্প সৃষ্টি করে থাকে। কাঠের তৈরী লোক ও কারুশিল্প সৃষ্টিতে যেসব শিল্পী, কারিগর সংশ্লিষ্ট তারা বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকে কাঠ ও চিত্র মাধ্যমে যুগপৎ কাজ করতে অভ্যস্ত। এরা সূত্রধর বলেও পরিচিত। এছাড়া পাথর ও মাটি এই দুই মাধ্যমেও সূত্রধরগণ কাজ করতে পারত। বাংলাদেশে কাঠের কাজের-লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্য ও ধারা অতিদীর্ঘকালের। যদিও বাংলাদেশে কাঠ ছাড়াও পাথরের উপাদানে মূর্তি নির্মাণ করেছে এই সূত্রধর সম্প্রদায় মৌর্যপূর্ব যুগ থেকে। তথাপি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এদেশে কাঠ সহজলভ্য, পাথর নয়। কাঠ এদেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। এ কারণে বলা যায়, বাংলাদেশে কাঠের ভাস্কর্য পাথরের ভাস্কর্যের তুলনায় অধিকতর প্রাচীন। এদেশের আবহাওয়া ও জল বায়ুর জন্য কাঠের ভাস্কর্যের, কাজের প্রাচীনতম নিদর্শনগুলো রক্ষা করা সম্ভব হয়নি বলে দশম ও একাদশ শতাব্দী পূর্ব কাঠের ভাস্কর্য ও অলংকরণ কাজের কোন নিদর্শন সংরক্ষিত নেই।

এ প্রসঙ্গে ১৩৩৯ বৈশাখে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলার রসকলা সম্পদ প্রবন্ধে গুরুসদয় দত্ত উল্লেখ করেছেন "বাংলাদেশের নৈসর্গিক অবস্থানমূলক কারণবশতঃ পাথরের অপেক্ষাকৃত অভাবে বাংলার ভাস্করগণ যে বেশীরভাগ

পাথরের পরিবর্তে কাঠের ও মাটির উপরে তাহাদের শিল্প কৌশল প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহাতে তাহাদের ভাস্কর্য কলাকৌশলের বিন্দুমাত্রও গৌরবহানি বর্তায় না। পরন্তু ইহা সর্ববাদি সম্মত যে, কাঠ-ভাস্কর্যে সুনিপুন ভাস্কর যদি পাথরের কাজ করিবার সুযোগ লাভ করেন, তাহা হইলে তাহাতেও তিনি তাহার শিল্পকৌশল ষোলআনা প্রদর্শন করিতে পারেন এবং ইহাও নির্ধারিত হইয়াছে যে, সুদুর অতীতে অশোক যুগে সাচি ও ভারহুতের ভাস্কর্য শিল্পীগণ প্রথমে কাঠের কাজেই তাহাদের অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। ..... পরিকল্পনার নিখুত নির্মলতায় ও গৌরবে, ভাবের ও রসের নিবির অভিব্যাঞ্জনায়, কারুকার্যের সুনিপুন ছন্দে এবং স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে মানব দেহের অংগপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য ও লালিত্যের রূপসৃষ্টিতে এই দারুসৃষ্টিগুলি জগতের ভাস্কর্য শিল্পে যে অতি উচ্চ স্থান অর্জন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রয়োজনীয় অংশগুলির কারুকার্য সম্পূর্ণরূপে করিবার ও নিষ্প্রয়োজনীয় গুটি কয়েক অংশ ইচ্ছাপূর্বক অসম্পূর্ণ রাখিবার যে প্রণালী রঁদ্যা প্রভৃতি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের নিপুনতার চুড়ান্ত লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়। বাংলার দীনদরিদ্র পল্লীভাস্করগণের কাজে এই উচ্চ প্রতিভামূলক লক্ষণের স্বভাবজাত অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। এই অনুপম কৌশল সম্পন্ন পল্লীভাস্করগণ ও তাহাদের স্বভাব সিদ্ধ কলাকৌশল বাঙালীর একটি অমুল্য জাতীয় সম্পদ। কিন্তু বর্তমানকালে উৎসাহের অভাবে ইহারা এবং ইহাদের শিল্প কৌশল অতি শীঘ্রই বাংলাদেশ হইতে সম্পূর্ন বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে" এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে সূত্রধর সম্প্রদায় কাঠেরমত সহজলভ্য প্রাকৃতিক উপাদানকে কাজের, সৃষ্টির, ভাস্কর্যের মাধ্যম হিসেবে প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি অব্যাহতভাবে ব্যবহার করে চলেছেন। ফলশ্রুতিতে সুত্রধর সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্মে বাস্তুবিদ্যা থেকে ভাস্কর্য, ভাস্কর্য থেকে কাঠের পুতুল ও খেলনা এবং সর্বপরি দৈনন্দিন, গার্হস্থ্য জীবনের উপযোগিতামূলক আনুষঙ্গিক কাঠের জিনিস পত্র রয়েছে। বিচিত্র মাত্রার, রূপের, গড়ণের পরীক্ষামূলক ও বংশ পরম্পরায়ের দক্ষতার পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক-সৃষ্টিমূলক কাজের পরিচয়, আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে, গৃহে, মন্দিরে, ব্যক্তিগত সংগ্রহে, যাদুঘরে রক্ষিত প্রাচীন নিদর্শনসমূহে এবং লোকশিল্পের প্রবহমান ধারায় খুজে পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে কালী প্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় তার "মধ্যযুগে বাংলা" গ্রন্থে লিখেছেনঃ "১১৭২ সালের নির্মিত পাকা চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দার বাড়ির প্রান্তে খোদিত যে হাতি শুঁড়া ও বাঘের মুখ দেখিয়াছি একালে কোন বাঙালী ছুতারকে আর তত সুন্দর প্রস্তুত করিতে দেখিনা। প্রায় দুইশত বর্ষ পূর্বের এক মাটির চণ্ডীমণ্ডপের চারিটি কাঠালের খুটি ৫০ বৎসর পূর্বে দেখিয়াছি। এখনো স্পষ্ট মনে আছে, তাহার উপরে খোদিত অদ্ভুত কারুকার্য আর এদেশে দেখা যায় না" মূলতঃ কাঠের তক্ষণ, ভাস্কর্য, কাঠের কাজের প্রাচীন ধারার প্রবহমান ধারা এখনো সূত্রধরদের মধ্যে সক্রিয়। এই সুত্রধরগণই যে কোন ঘর-কাঁচাই হোক আর পাকাই হোক বানাতে গিয়ে দরজা চৌকাঠ, খুটি, কড়ির কাজে কাঠ খোদাই করে তাদের সৃষ্টি, দক্ষতা ও কারিগরি জ্ঞানের পরিচয় দিতেন। এসব কাজ করতে গিয়ে ভাস্কর্য সৃষ্টির প্রয়াস পেতেন। অর্থাৎ সুত্রধরগণ কাঠের মাধ্যমে লোক ভাস্করের কাজ করেছেন। এই শিল্পীগণ কাঠের আসবাব, খাট, পালংক, চৌকি, তৈজশপত্র, কাঠের পুতুল ও খেলনা তৈরী করেছেন অর্থাৎ আজও প্রাচীন সূত্রধরগণের আজকের প্রজন্ম বর্তমান আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পেক্ষাপটে প্রতিকুল অবস্থায় পতিত হয়েও ক্ষীণ ধারায় হলেও উল্লিখিত কাঠের কাজ করে চলেছে।

সূত্রধরগণের সৃষ্টির ক্ষীণ অথচ সচল ধারার প্রবাহ এখানো খুজে পাব কাঠের নানা কাজে, এরমধ্যে কাঠের চিত্রিত পুতুল ও খেলনা অন্যতম। এখনো এই ধারার উপস্থিতি ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রামে বিদ্যমান। উল্লিখিত পুতুল ও খেলনার মধ্যে রয়েছে চাকাওয়ালা হাতী, ঘোড়া, বাঘ এবং কাঠের মমি পুতুল ইত্যাদি। এসব পুতুল ও খেলনা আমড়া, জিয়ল, শ্যাওড়া, ছাতিম ও শিমুল প্রভৃতি কাঠ থেকে তৈরী হয়। এগুলো নরম কাঠ, কারুশিল্পী সূত্রধরগণ এসব কাঠে ভাস্কর্য-জাত ত্রিমাত্রিক, চতুমাত্রিক পুতুল ও খেলনা তৈরীতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। সূত্রধরগণ চারপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে অতি সহজে সংগ্রহ করা এসব কাঠে তাদের পূর্বপুরুষের কারিগরি জ্ঞান, কৌশল ও দক্ষতার উপর নির্ভর করে গ্রামীন লোকসমাজের সাধারণ মানুষের জন্য সৃষ্টি করে চলেছে চিত্রিত খেলনা ও পুতুল। অঞ্চল ভেদে, সূত্রধরদের পরিবার ভেদে, ব্যক্তি কারুশিল্পী ভেদে, কালভেদে এসব পুতুল ও খেলনার পড়নে, রূপে, কৌশলে, অলংকরণে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য ও সনাক্ত করার মত। অভিন্ন সাধারণ একটি ধাচ, চরিত্র হয়ত রয়েছে। কিন্তু উল্লিখিত পর্যায় পর্যালোচনা, মূল্যায়ন সর্বপরি বিশ্লেষণমূলক জরিপ করা হলে কাঠের খেলনা ও পুতুলের বৈশিষ্ট্যসূচক দিকগুলো, পরিবর্তন, রূপান্তরের ধারাগুলো বহুমাত্রিক গবেষণার মাধ্যমে সনাক্ত করা সম্ভব হবে।

সময়ের সঙ্গে পাল্লাদিয়ে এই কাঠের পুতুল ও খেলনা রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত প্রবহমান ধারায় পুরুজ্জীবিত হচ্ছে, সচল রয়েছে, ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

পূর্বে উল্লেখ করেছি বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে কাঠের খেলনা ও পুতুল সূত্রধরগণ তৈরী করেন। এসব পুতুল ও খেলনার মধ্যে কাঠের হাতি, ঘোড়া, বাঘ এবং মমি পুতুল উল্লেখযোগ্য। বছরের নানা সময়ে যেমন চৈত্র সংক্রান্তি, পৌষ মেলা, বারনি, দূর্গাপুঁজার সময়ের মেলা, ঈদের, মহররমের মেলা, এমনকি এখনকার আধুনিক নগরে ও শহরে আয়োজিত বিশেষ মেলায় এসব কাঠের পুতুল ও খেলনা বিক্রি হয়।

উল্লিখিত চিত্রিত কাঠের পুতুল ও খেলনার ব্যবহারে বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে একটি সাধারণ অভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। এই অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর ব্যবহার শিশুদের আনন্দ ও ঘরের অন্যান্য আসবাবের সঙ্গে শোভা বৃদ্ধি।

এ প্রসঙ্গে ঢাকার, এখনকার নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের কাঠের চাকাওয়ালা এককাঠের কালো রং এর চিত্রিত হাতী, হলুদ রং এর চিত্রিত ঘোড়া ও বাঘ এবং বিচিত্র রংএর মমি পুতুল বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। সোনারগাঁয়ের এসব কাঠের খেলনা ও পুতুলের সমাদর ও জনপ্রিয়তা সারা বাংলাদেশে। লোকজীবনের লোকশিল্পের ঐতিহ্যের ধারার মতই প্রবহমান ও চলমান। এমনকি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেও এর প্রসার লাভ করেছিল। সোনারগাঁয়ের প্রাচীন লোকমেলা লাঙলবন্দ ও কুমিল্লার গঙ্গাসাগর মেলার মাধ্যমেই এসব কাঠের পুতুল ও খেলনা দেশের ও ভারতের বহু জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে সোনারগাঁয়ের কাঠের খেলনা ও পুতুল ঢাকা মহানগরীর আধুনিক কারুশিল্পের দোকান, বিপনী কেন্দ্রে বিক্রির জন্য বাজারজাত হচ্ছে। বিদেশে নিয়মিত রপ্তানী হচ্ছে। এখন দেশে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান যাদুঘরেও সোনারগাঁয়ের কাঠের হাতী, ঘোড়া এবং পুতুল সংগৃহীত, সংরক্ষিত এবং প্রদর্শিত হচ্ছে।

কাঠের চিত্রিত খেলনা ও পুতুল তৈরীতে সোনারগাঁয়ে এখন মোট তিনটি সূত্রধর পরিবার তাদের পূর্বপুরুষের পেশাকে অনুসরণ করে কাজ করছে। এদের মধ্যে মৃত নরেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধরের নাম সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয়। তার মৃত্যুর পর তার পূত্রদের মধ্যে মাত্র একজন পূর্বপুরুষের পেশা চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া নরেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধরের চাচাত ভাই মনীন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর এবং তার ভাই গোপালচন্দ্র সূত্রধর সোনারগাঁয়ে এখনো কাঠের চিত্রিত পুতুল ও খেলনা তৈরীর কাজ করছেন। এই তিন পরিবারের মধ্যে নরেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তিনি ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী পুরুস্কারে পুরস্কৃত হন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এবং শিল্পী কামরুল হাসান নরেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধরের শিল্পকর্ম বিখ্যাত এক কাঠের চাকাওয়ালা হাতী ও ঘোড়াকে পুরুজ্জীবনের প্রয়াস নেন এখন থেকে পঁচিশ বছর আগে এবং এই দুই মহান শিল্পী নরেন্দ্রচন্দ্র সূত্রধরকে দেশের একজন জনপ্রিয় কারুশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন, মর্যাদা দেন। নরেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধরের তৈরী প্রসিদ্ধ হাতী ও ঘোড়া স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছিল। তার শিল্পকর্ম বিশেষ করে হাতী ও ঘোড়া দেশের ও বিদেশের বহু যাদুঘরে রক্ষিত আছে। সোনারগাঁয়ের অন্য দুটি পরিবারের সূত্রধরগণের তৈরী ঐ অভিন্ন রূপের, গড়ণের হাতী ও ঘোড়ার সঙ্গে নরেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধরের তৈরী হাতী ও ঘোড়ার বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য অতি সহজেই চোখে পরে, সনাক্ত করা যায়। যদিও সোনারগাঁয়ের হাতী, ঘোড়া ও পুতুল তৈরীর কৌশল ও দক্ষতার ধারা প্রায় এক ও অভিন্ন, বংশপরম্পরায় থেকে চলে আশা লোককারুশিল্পের অন্তর্ভূক্ত, তথাপি এখানকার প্রতিটি শিল্পকর্মে শিল্পীর, কারিগরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ এতে পড়ে অনিবার্যভাবে। লোকশিল্পের বিশ্লেষণের পদ্ধতির ধারায় এই বৈশিষ্ট্যকে মুল্যায়নের অবকাশ রয়েছে। আর এজন্য লোকশিল্প লোকমনের, লোকজীবনের হলেও শিল্পীর নিজ বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যময় লোকশিল্প–কাঠের চিত্রিত ঘোড়া ও হাতীর বৈশিষ্ট্যকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়। নরেন্দ্র চন্দ্র সুত্রধরও চিরায়ত লোকজ কৌশল ও দক্ষতাকে অনুসরণ করেছিলেন মাত্র। তবে তিনি বাড়তি যোগ করেছিলেন তার শৈল্পিক ব্যক্তিত্ব–বৈশিষ্ট্য। ফলে লোকশিল্পের অন্তর্ভূক্ত হয়েও সাধারণ হাতী ও ঘোড়া নরেন্দ্রের হাতী ও ঘোড়ায় পরিণত হয়েছিল। ঠিক একইভাবে বর্তমানে মনীন্দ্রচন্দ্র সূত্রধর তার নিজ বৈশিষ্ট্যের চিত্রিত কাঠের হাতী, ঘোড়া ও পুতুল তৈরী করছেন। এ প্রসঙ্গে কেবল Contextual গবেষণা ও দলিলকরনে বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে।

এখানে উল্লেখ্য যে, সোনারগাঁয়ের এই বৈশিষ্ট্যময় হাতী ও ঘোড়া পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া শান্তিপুরেও বর্তমানে তৈরী হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে Indian Dolls and Toys গ্রন্থের লেখক অজিত মুখার্জির মন্তব্য প্রণিধাণযোগ্য " Santipur Nadia. refugee toymakers have settled here and manufacture wooden horses, elephants, figure toys etc. Large sized-toys are also made" এতেই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ের লোকজ

বৈশিষ্টের কাঠের হাতী, ঘোড়া ও পুতুল তৈরীর ধারা কেবল কালভেদেই অব্যাহত নয় অঞ্চল ও দেশ ভেদেও অব্যাহত। উল্লিখিত গ্রন্থে প্রকাশিত চাকাওয়ালা চিত্রিত কাঠের হাতীর ছবিই তার প্রমাণ।

সোনারগাঁয়ের কাঠের চিত্রিত হাতী, ঘোড়া, বাঘ ও মমিপুতুলের আকার, গড়ণ লোকজীবনে ও লোকমনে প্রতিষ্ঠিত। সুত্রধর শিল্পীগণের বংশানুক্রমিক পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা এইসব উপাদান পরিপূর্ণ সুষমামণ্ডিত, ছন্দময়, বর্ণাঢ্য চিরায়ত কালজয়ী খেলনা ও পুতুলের আকার ও গড়ণ সৃষ্টির অনিবার্য পরিমাপ আবিষ্কার সম্ভব করেছে। যেমন ঘোড়া ও হাতী তৈরীতে দৈর্ঘ ৪ প্রস্থ ২ এবং উচ্চতা ৬ এই সাধারণ আনুপাতিক নিয়ম অনুসরণ করা হয়। এই অনুপাতেই হাতী ও ঘোড়ার আকার বড় ও ছোট করা হয়। প্রথমে উপরে উল্লিখিত আনুপাতিক মাপে করাত দিয়ে কাঠ কেটে আয়তাকার কাঠ খণ্ডে পরিণত করা হয়। এর পরে হাতুরি, বাসলি, উকা ও বাটালী এই সামান্য যন্ত্রপাতি দিয়ে সোনার— গাঁওয়ের সূত্রধরগণ দ্রুতগতিতে, আপনমনে, অনায়াসে পুতুল ও খেলনা তৈরী করেন। লোহার হাতুরি দিয়ে বা কাঠের মুগুর দিয়ে প্রয়োজন অনুসারে আঘাতের মাত্রা বাড়িয়ে ও কমিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে ভাস্কর্য সৃষ্টির সকল পুথিগত আধুনিক ব্যাকরণ ও পদ্ধতিকে উপেক্ষা করে নানা গড়নের পুতুল ও খেলনা গড়ে, তৈরী করে। কাটা ও মোটাদাগের খোদাই এর প্রাথমিক কাজটি হয়ে যাওয়ার পর কৌশলের বিচিত্র শৈল্পিক মাত্রা যোগ করে অর্থাৎ হাতের সাধারণ ছোয়ার মধ্যদিয়ে একটি পরিপূর্ণ ভাস্কর্যগুণের খেলনা ও পুতুলে পরিণত হয়। খেলনা হাতী, ঘোড়া ও বাঘ চতুর্মাত্রিক এবং মমি পুতুল ত্রিমাত্রিক। প্রতিটি খেলনার নীচের অংশে পুরুপাটাতন সৃষ্টি করা হয়। ঘোড়া, হাতী ও বাঘকে যাতে টেনে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এই লক্ষ্যে শিল্পী এতে চারটি কাঠের চাকা সংযোজন করেন। এতে খেলনা চলমান খেলনায় পরিণত হয়। মমি পুতুল এরকম নয়। মমিপুতুল ৪ ইঞ্চি থেকে ৯ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য, সাধারণতঃ এই মাপেরই করা হয়।

এরপরে রং লাগানোর কাজ। মূল শিল্পী খোদাই এর কাজ করেন। এরা সাধারণতঃ রং লাগান না। তবে রং লাগানোর বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। সাধারণত মূল কারুশিল্পীর সহযোগী কারুশিল্পীরা এই কাজটি করে। প্রধান কারুশিল্পীর পরিবারের অন্যান্য সদস্য স্ত্রী, বোন, মেয়ে, ছোটভাই এবং পরিবারের অন্য সদস্য রং দেয়ার কাজটি করে থাকে। সোনারগাঁয়ের চিত্রিত হাতী, ঘোড়া, বাঘ এবং মমি পুতুলে রং দেয়ার যে প্রচলিত রীতি চলে আসছিল তা এখন অনেক ক্ষেত্রেই অনুসৃত হচ্ছে না। ফলে সময়ের ও কালের ব্যবধানে এক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে অনিবার্যভাবে। যেমন রং দেয়ার ব্যাপারটাই ধরা যাক। প্রচলিত রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী এমনকি ৩০ বছর আগেও যে ভাবে রং দেয়ার কাজটি অনুসরণ করা হত এখন তা পুরোপুরি অনুসৃত হচ্ছে না। আগে তেতুলের বিচির গুড়া সিদ্ধ করে আঠা বা লেই তৈরী করে সেই লেই এর সঙ্গে লাল, নীল, হলুদ, কালো ও মেটে রং মিশিয়ে খেলনা ও পুতুলে রং দেয়ার উপযোগী করে প্রয়োজন মত ঘন করে হাতে তৈরী রং বানানো হতো। সহজ লভ্য হরিতকি, গিরিমাটি, হিংগল, নীল এবং ভূসাকালি থেকে উল্লিখিত রং কারুশিল্পীরা নিজেরাই ঘরে তৈরী করতেন। এছাড়া সাদা রং তৈরী করা হত সাবুদানা, বার্লি গুড়া করে পানিতে গুলিয়ে ভালো করে সিদ্ধ করে লেই বা আঠা বানিয়ে তাতে চকঘড়ি মিশিয়ে। পুরানো ধারার প্রচলিত এই রং বানানোর পদ্ধতি সোনারগাঁয়ের সকল সূত্রধর সম্প্রদায়ের কারুশিল্পীদের মধ্যে বংশপরম্পরায় চলে আসছে। সবারই জানা ছিল। এক অলিখিত ভেষজ জ্ঞানের পদ্ধতি, তাদের জীবনের চারপাশের পরিবেশ তাদেরকে অনিবার্যভাবে শিখিয়েছে। এই জ্ঞান নিশ্চয় যুগযুগ ধরে ব্যবহারিক জ্ঞানের, অভিজ্ঞতায় এবং দক্ষতার পরিসীমায় একটি গ্রহণযোগ্য লোকজধারায় পরিগণিত হয়েছিল বলেই অলিখিত অথচ প্রতিষ্ঠিত এই পদ্ধতি। কালের পরিবর্তনে এদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের ধারা লক্ষণীয়। লোক ও কারুশিল্প এ থেকে পরিত্রাণ পাবে কি করে? ফলে সোনারগাঁয়ের সূত্রধরদের বংশপরম্পরায় চলে আশা কাঠের পুতুল ও খেলনার রং এখন প্রাচীন পদ্ধতির ঘরে তৈরী রং এর বদলে বাজারের আধুনিক সিনথেটিক রং শিল্পীরা তাদের খেলনা ও পুতুলে ব্যবহার করছে। সোনারগাঁয়ের সূত্রধর শিল্পীরা যদিও কাঠের চিত্রিত পুতুল ও খেলনায় রং লাগানোর পদ্ধতি পুরানো নিয়মে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু সময়ের ও গ্রামীন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের দরুন এতে কিছু ব্যতিক্রম ঘটছে। প্রথমে শিল্পী তার তৈরী কাঠের পুতুল ও খেলনার আদল, গড়ণ সৃষ্টি করে। এর পরে রোদে শুকানো হয় তিন থেকে চার দিন ধরে। তারপর সেগুলোকে শিরিশ কাগজ দিয়ে ভালো ভাবে ঘষা হয়। ঘষার পর কাঠের পুতুল ও খেলনার আদল, গড়নের বিভিন্ন অংশ ফুটে উঠে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন ফুটে উঠে। পরিপূর্ণ ভাস্কর্যের গুণ লাভ করে। উপরিভাগ মসৃণ হয়। এর পর সূত্রধর শিল্পীগণ পুরানো লোকজ ধারায় খেলনা ও পুতুলের অঙ্গে সাবুদানা গুড়া অথবা বার্লির আঠার সঙ্গে চকখড়ি মেশানা রং এর প্রাথমিক আস্তরণ দেয়। সাদা রং লাগিয়ে পুনরায় একদিন শুকাতে হয়। এর পর শিল্পী কাল,

হলুদ, লাল, সবুজ এবং নীল ইত্যাদি রং লাগাতে কাপড় দিয়ে কোনা করে ও ছাগলের লেজের চুল দিয়ে হাতে বানানো যথাক্রমে মোটা ও চিকন তুলি ব্যবহার করা হয়। এ সব তুলি দিয়ে পুরানো নিয়মে তেতুলের বিচির আঠা এবং সাবুদানার আঠার সঙ্গে প্রাকৃতিক ভেষজ রং বা বাজারের গুড়া রং মিশিয়ে রং করার কাজ করা হত। এখন হাতে তেরী পুরানো নিয়মের রং এর বদলে সিনথেটিক রং দিয়ে খেলনা ও পুতুলে রং করা হয়। এছাড়া এখন পুরানো ধারার পরিবর্তন করে আধুনিক ব্রাসও শিল্পীরা ব্যবহার করছে। সোনারগাঁয়ের চাকাওয়ালা হাতী কালো রং এর, ঘোড়া হলুদ রং এর, বাঘ হলুদ এবং মমি পুতুল যেমন রাজা রাণী, মন্ত্রী, পাইক ইত্যাদি শিল্পীর সুবিধা মত রং লাল, গোলাপী হলুদ ইত্যাদি রং এর হয়। উল্লিখিত পুতুলগুলোর একটা সাধারণ রং দেয়া হয়ে গেলে চিকন ব্রাস দিয়ে নানা রং এর চিকন লাইন এঁকে অঙ্গসজ্জা করা হয়। হাতীর পিঠে মাহুতের বসার স্থানসহ অলংকৃত রাজকীয় আসন, ঘোড়ার পিঠে ঘোড়সওয়ারীর অলংকৃত আসন, হাতীর ও ঘোড়ার চোখ, কান এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অঙ্গসজ্জা এবং মমিপুতুলগুলোর পোষাক পরিচ্ছদ, অলংকার ইত্যাদি শিল্পীর তুলির নানা রং এর সৃষ্টিশীল দ্রুত অথচ সাবলীল দক্ষ আচড়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। এছাড়াও ঘোড়াকে কল্পনার ঘোড়া বানাতে তুলির আচড় দিয়ে শিল্পী ঘাড়ের দুপাশে উড়ন্ত পাখা এঁকে "পংখীরাজ ঘোড়া"য় পরিণত করে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের লোকশিল্পের অন্যতম সৃষ্টি মৃৎশিল্প ও মাটির পুতুলের চিত্রায়ণ পদ্ধতির সঙ্গে সোনারগাঁয়ের কাঠের খেলনা ও পুতুলের চিত্রায়নে মিল খুজে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে জনাব মুহাম্মদ সিরাজউদ্দিন তাঁর Living Crafts in Bangladesh গ্রন্থে সোনারগাঁয়ের চিত্রিত কাঠের পুতুল সম্পর্কে বলেন "wooden doll in Lakshmi Shara style" মূলত প্রাচীনকাল থেকে পোড়ামাটির পুতুলের গ্রামীন শিল্পী চিকন বাঁশের কাঠি দিয়ে কাঁচা মাটি অবস্থায় চাপ দিয়ে এবং দাগ কেটে যে ভাবে চোখ, কান, ঠোট, নাক, অলংকার, চুল ও অঙ্গসজ্জা সৃষ্টির মধ্যদিয়ে রেখার সৃষ্টি করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে রং দিয়ে চিত্রের মত এ কাজটি করতে শিল্পীর চিকন তুলির রঙ্গীন আচড়ে অনুরূপ রেখা অনিবার্যভাবে আবির্ভূত হয়েছে কাঠের পুতুলে ও খেলনায়। প্রায় এক ও অভিন্ন গুণাগুণ, ছাপ effect সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এ প্রসঙ্গে প্রাচীন পোড়ামাটির চার চাকার ঘোড়া পুতুলের কথাও এসে যায়। কারণ ধারণা করা হচ্ছে সোনারগাঁয়ের চিত্রিত ও কাঠের চাকাওয়ালা ঘোড়া ও হাতী সৃষ্টির পরিকল্পনায় সূত্রধরগণকে প্রাচীন চাকাওয়ালা পোড়ামাটির পুতুল একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিল। সবমিলিয়ে সোনারগাঁয়ের হাতী, ঘোড়া, বাঘ ও মমিপুতুল খেলনা ও পুতুলের চিত্রায়ণে ইম্প্রেশনধর্মী চিত্রকলার রূপ ও পদ্ধতির কথা মনে করিয়ে দেয়। অর্থাৎ শিল্পী সূত্রধরগণ নিজেরা বিষয়বস্তুকে যে ভাবে অনুভবে ও চেতনায় দেখেছেন ঠিক সেইভাবেই তাদের পুতুলে ও খেলনায় চিত্র অংকণের চেষ্টা করেন। বাস্তবে যে রূপ ও রং রয়েছে তাকে পরিহার, বাদ দিয়ে।

লোক শিল্পের ঐতিহ্য বাংলাদেশের গ্রামীন লোকসমাজ টিকিয়ে রেখেছে। বাংলাদেশের লোকসমাজ এদেশের জাতীয় সংস্কৃতির মূলশেকড়। বাংলাদেশের সংস্কৃতির মূলশেকড় সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যময় কালজয়ী লোকশিল্পের ধারা নানা পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করে সময়ের, কালের ব্যবধানে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে টিকে রয়েছে।

সোনারগাঁয়ের সূত্রধরগণের সৃষ্টি চিত্রিত কাঠের ঘোড়া, হাতী এবং পুতুল এদেশের কালজয়ী লোকশিল্পের সেরা নিদর্শণগুলোর অন্যতম। এই কালজয়ী চিত্রিত কাঠের ঘোড়া, হাতী এবং পুতুলের শিল্পীদের উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করা প্রয়োজন। এদের উজ্জীবিত করা হলে উল্লিখিত খেলনা ও পুতুল চিরায়ত ধারায় পুণরুজ্জীবিত হবে আগামী দিনের জন্য। সোনারগাঁওয়ে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন "শিল্পগ্রাম" কর্মসূচীতে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-লোক কারুশিল্পের পুরুজ্জীবনের লক্ষ্যে সোনারগাঁয়ের ঐতিহ্যমণ্ডিত লোকশিল্প চিত্রিত কাঠের হাতী, ঘোড়া ও পুতুলের এখনকার সর্বজৌষ্ঠ বর্ষিয়াণ কারুশিল্পী ৭৫ বছর বয়স্ক মনিন্দ্র চন্দ্র সূত্রধরের সৃষ্টি কর্ম, কৌশল, পদ্ধতি, দক্ষতা সনাক্ত ও দলিলিকরণ করা প্রয়োজন। এবং সোনারগাঁয়ের এই খেলনা ও পুতুলের পুনরুজ্জীবনের জন্য মনিন্দ্র চন্দ্র সূত্রধরকে দিয়ে শিল্প গ্রামে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এর ফলে আজকের প্রজন্ম সোনারগাঁয়ের কালজয়ী চিত্রিত হাতী, ঘোড়া, ও পুতুল তৈরীতে সক্ষম হবে। ইতিমধ্যে উল্লিখিত কর্মসূচীতে নতুন প্রজন্মের মধ্যে যারা সূত্রধর সম্প্রদায়ের নন, এমন কয়েকজন প্রশিক্ষনার্থী সোনারগাঁয়ের বৈশিষ্ট্যময় হাতী, ঘোড়া ও পুতুল বানানোর কৌশল ও দক্ষতা আয়ত্ত করার চেষ্টা করছে। এরা বয়সে অতিশয় নবীন—বালক। ধারণা করা হচ্ছে এভাবেই পুনরুজ্জীবনের কর্মসূচী অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশের সকল লুপ্তপ্রায় চিরায়ত লোকশিল্পের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে দিয়ে ঐতিহ্যের চিরায়ত লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হবে। সম্ভব হবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবহেলিত লোক কারুশিল্পের দক্ষ বর্ষিয়ান

কারুশিল্পীদের উজ্জীবিত ও উৎসাহিত করা। তা কেবল সম্ভব হবে শিল্প গ্রামের কর্মসূচী–লোকশিল্পের প্রশিক্ষণ–উৎপাদন ও বিক্রয়ের মাধ্যমে।

বোধকরি সোনারগাঁয়ের চিত্রিত কাঠের চাকাওয়ালা হাতী, ঘোড়া, বাঘ এবং পুতুল লোকশিল্পের চিরায়ত সুষমা ও শৈল্পিক নমনীয়তার গুণে সমৃদ্ধ, যা মৃন্ময়শিল্প–পোড়ামাটির পুতুল, ও চিত্রিত মাটির পুতুলে লক্ষ্যণীয়। সোনারগাঁয়ের চিত্রিত কাঠের হাতী, ঘোড়া, বাঘ এবং পুতুলে কারুশিল্পী শৈল্পিক নমনীয়তাকে তার বংশপরম্পরায়ের কৌশল ও দক্ষতার চমৎকারী গুণে ফুটিয়ে তুলেছেন সাবলীলভাবে, সাচ্ছন্দে। ❑

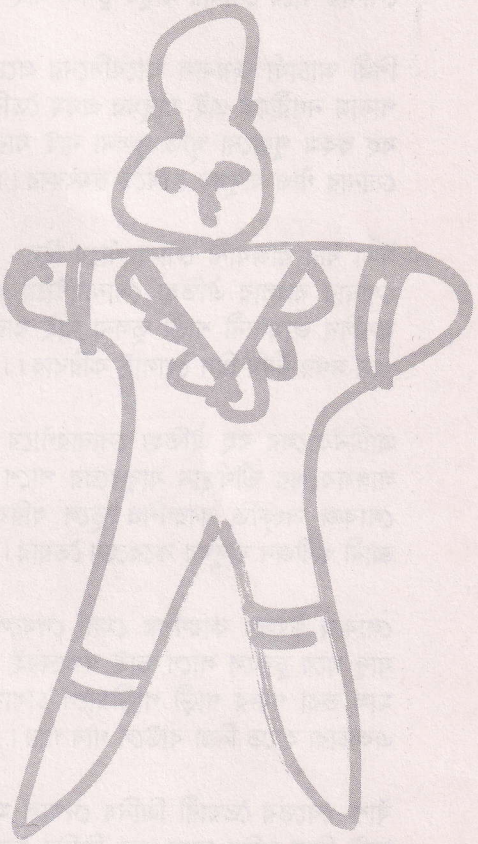

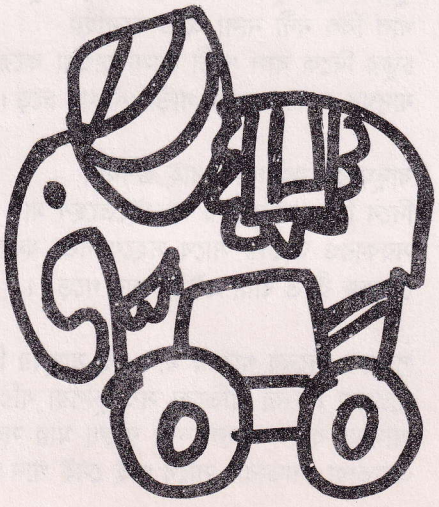

সোনারগাঁও যাদু ঘরের ঐতিহ্যের কবি গান

গীতিকার—মোঃ হারেজ মিয়া সরদার

আছেন যত দেশবাসি শোনেন দিয়া মন
সোনার গাঁয়ের ঐতিহ্য কিছু করে যাই বর্ণন
সোনারগাঁ ফাউণ্ডেশনের গাইব মোরা জারী
সোনার গাঁয়ে সোনার মানুষ তুলনা নাই তারি।।

শিল্পী আচার্য্য জয়নাল আবেদিনের প্রচেষ্টার পরে
পানাম নগরীতে এই যাদুঘর প্রথম তৈরি করে
বহু রকম পুরানো স্মৃতি তুলনা নাই যার
সোনার গাঁও যাদুঘর দেখতে চমৎকার।।

ঈসা খাঁর রাজধানী সোনারগাঁয়ে ছিল
সোনার বাংলার ঐতিহ্য সোনারগাঁয়ে রাখিল
মসলিন জামদানী শাড়ী তুলনা নাই যার
খাস নগর দীঘি ছিল ধোলাই করিবার।।

প্রাচীনকালের বহু ঐতিহ্য সোনারগাঁয়ে আছে
লাঙ্গলবন্দের তীর্থস্থান যাদুঘরের পাশে
লোকজ সংস্কৃতি কারুশিল্প তুলে ধরিবার
জ্ঞানী গুণীজন যাদুঘর করেছেন তৈয়ার।।

লোকজ উৎসব কারুশিল্প মেলা দেখলে ভরে মন
যাদু ঘরে ঢুকলে লাগে ভাই স্বপনেরই মতন
মাল ভরা গরুর গাড়ী গাড়ীয়ালে চালায়
একতারা হাতে নিয়া বাউলে গান গায়।।

বাঁশ-বেতের তৈয়ারী জিনিষ দেখলে মন ভরে
মাটি দিয়া হরিণ ময়ুর কত জিনিষ তৈয়ার করে
মটকা কলস কাঠ খোদাই পাক পাতিল যত,
লোক অলংকার সাজায়াছে করে মনের মত।।

মৌসমে মৌসমী মেলার করে আয়োজন
মেলা দেখতে চলে আসে বহু লোক জন
কত রঙ্গের গ্রামীন খেলা জারী সারি গান
বাউল সুরে উদাস করে সকলেরই প্রাণ।।

কিস্‌সা পুঁথি গম্ভীরা আরও ছড়া গান
পুরানো দিনের লোক গীতি উদাস করে প্রাণ
নানান রঙ্গের দোকান পসার বসে সারিসারি
খাদ্য সামগ্রী মিঠাই মন্ডা রাখছে তৈয়ার করি।।

শুলুক কিস্‌সা কবিতা আরও গাজীর গান
ছেলে মেয়ে যুবক শুনে বড় শান্তিপান
দেখে শুনে সবাই ভাবে একি চমৎকার
পুরানো দিনের বিষয় বস্তু যাদুর আকার।।

একতারা দোতারা পাতিল চটি বাজাইয়া
ভাব উদয় করতো কত দয়াল গান গাহিয়া
সেই পুরানো দিনের বাউল গানের রাখিতে মান
যাদুঘরে ঐ সকল গানের দিয়াছে সম্মান।।

শিল্প গ্রাম কর্মসূচী মিনি বাংলাদেশ
কারু মডেল বাংলাদেশ লোকজ পরিবেশ
সেল্‌স সেন্টার লাইব্রেরী করিতে তৈয়ার
বিশ্ববাসী সবাই আসে তাহা দেখিবার।।

ষাট বিঘা লেকে আছে নানা রঙের মাছ
আম জাম বাঁশ বেত কতশত গাছ
উপজাতিদের গ্যালারি করিতে তৈয়ার
মাষ্টার প্লানে নতুন যাদুঘর গড়িবেন এইবার।।

পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর পাশে এই যাদুঘর
খাল বিল নদী নালা অতি মনোহর
চতুর দিকে বাস গাড়ী আসা যাওয়া করে
যাদুঘর দেখতে আসে গাড়ী নৌকায় চড়ে।।

যাদুঘরের কর্মীগণ সবাই গুণবান
দিনে দিনে যাদুঘরের বাড়াইতেছেন মান
সরকারও তাদের সাথে সহযোগিতা করে
লোকজ রীতি দ্বারা এই যাদুঘর গড়ে।।

পুরানো দিনের গানের মান এই যাদুঘর দিল
হারানো দিনের ঐতিহ্যে সব তুলিয়া ধরিল
আমারা বাউল বাংলাদেশী বাংলা মার সন্তান
একতারা দোতারার সাথে গাই সেই গান।। ❑

ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ে—বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন

বিশ্বনাথ সরকার
গবেষণা অফিসার
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন

বর্তমান সোনারগাঁকে দেখে কখনই মনে হবে না যে, এখানেই ছিল মুসলিম বাংলার তিনশত কুড়ি বৎসরের রাজধানী। পৃথিবীখ্যাত সূক্ষ্ম বস্ত্র মসলিন ক্রয় করতে মেঘনা তীরের এ সোনারগাঁয়ে ভীড় জমাত সারা দুনিয়ার অনেক বণিক, অনেকে মসলিন বস্ত্র ক্রয় করে এবং অনেকে মসলিন বস্ত্র দেখে মুগ্ধ হতো। বিখ্যাত মুসলিম পর্যটক আবু আল বেরুনী হাজার বছর পূর্বে তাঁর লেখা আরবী ভাষায় "কিতাবুল হিন্দ" নামক গ্রন্থে সোনাগাঁওকে স্বর্ণদ্বীপ ও একটি প্রাচীন জনপদ বলে উল্লেখ করেছেন। এই স্বর্ণদ্বীপই কালক্রমে সুবর্ণগ্রাম, স্বর্ণগ্রাম ও পরে সোনারগাঁও নামে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে।

সোনারগাঁও এক সময়ে এথেন্স, ব্যাবিলন এবং রোমের মতই বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন নগরী ছিল। নদীমাতৃক বাংলাদেশের মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী, শীতলক্ষ্যা, পদ্মা ও তুরাগ প্রভৃতি নদ-নদীর দ্বারা পরিবেষ্টিত সোনারগাঁও ছিল সামরিক দিক দিয়ে অনেকটা নিরাপদ। স্বর্ণদ্বীপ বা সোনারগাঁও অতি প্রাচীন নগরী হলেও মুসলিম শাসন পূর্ব কাল সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। তবে সোনারগাঁও ছিল স্বাধীন বাংলার রাজধানী। সোনারগাঁয়ের প্রকৃত অবস্থান এবং আয়তন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক জেমস ওয়াইজের মতে "বৈদ্যের বাজার থানাধীন মোগড়াপাড়াই সোনারগাঁও"। সৈয়দ আওলাদ হোসেন সোনারগাঁয়ের আয়তন সম্পর্কে লিখেছেন "সোনারগাঁও এর দৈর্ঘ্য ছিলো ৪৮ মাইল এবং প্রস্থ ছিলো ২০ মাইল।" ডঃ আহমেদ হাসান দানী সোনারগাঁও সম্বন্ধে লিখেছেন "সোনারগাঁয়ের উৎপত্তি হচ্ছে স্বর্ণগ্রাম থেকে নারায়ণগঞ্জের ৩ মাইল পূর্বে মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত সোনারগাঁও"। "সোনারগাঁও শব্দের অর্থ হচ্ছে সোনারগাঁ শহর।" তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী গ্রন্থে জিয়াউদ্দিন বারানী লিখেছিলেন "১২৮১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট গিয়াসউদ্দিন বলবন সোনারগাঁও সফর করেন", রোমান্স অব এন ইষ্টার্ন ক্যাপিটাল গ্রন্থে বলা হয়েছে, "পূর্বে লক্ষ্যা নদী, দক্ষিণে মেঘনা আর পশ্চিমে ইছামতি নদীর তীর ভূমি থেকে শুরু করে উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত ৭০ মাইল দীর্ঘ অঞ্চলটিতে সোনারগাঁও রাজ্য অবস্থিত ছিল।" সোনারগাঁয়ের আয়তন নিয়ে বিতর্ক থাকলেও সমগ্র বাংলাদেশ ছাড়াও বিহার, উড়িষ্যা ও অযোধ্যা পর্যন্ত সোনারগাঁয়ের সুলতানদের অধীনস্থ রাজ্য সীমা ছিল। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ১৬৬২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের বার ভুঁইয়াদের রাজত্ব কালে সোনারগাঁ ছিল বর্তমান বৃহত্তম ঢাকা থেকে সিলেট পর্যন্ত বিস্তৃত।

ঐতিহাসিক সোনারগাঁ শুধু রাজনৈতিক কারণেই সুপরিচিত ছিল না বরং সোনারগাঁয়ের তৈরি ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প, মসলিন বস্ত্র, চীন, মিশর, সুমাত্রাসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশেও তখন রফতানী হতো, এছাড়াও সোনারগাঁয়ের তৈরি কাঠের ঘোড়া, হাতীসহ বিভিন্ন ধরনের কাঠের পুতুল এবং ঝিনুকের তৈরি হস্তশিল্প রফতানি হতো ভারতবর্ষের সর্বত্র। ১৩৪৫ সালে বিখ্যাত মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতা সোনারগাঁয়ে সফর করেন এবং এখান থেকে জাভা গমন করেন। চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চীনের রাষ্ট্রদূত সোনারগাঁও সফর করে লিখেছেন "সোনারগাঁও একটি দেয়াল ঘেরা শহর, এখানে অনেক বৈচিত্র্য, খাল, রাস্তা ও বাজার রয়েছে। বহির্বিশ্ব থেকে এখানে বহু দ্রব্য আমদানী এবং এখান থেকে বহু দ্রব্য বহির্বিশ্বে রফতানী করা হতো।"

১৫০৩ খৃষ্টাব্দে হোসেন শাহের শাসনামলে একজন রোমান পর্যটক সোনারগাঁও সফর করেন। এই পরিব্রাজক হোসেন শাহের রাজ্যের বিস্তার ও সেনাবাহিনীর আকার দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যান, তার মতে হোসেন শাহের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লাখের মতো। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে রেলফিচ সোনারগাঁ সফর করে লিখেছেন, "শ্রীপুর থেকে ১২ মাইল দূরে সোনারগাঁও একটি শহর । সারা ভারতের মধ্যে সর্বোত্তম ও সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্র এখানেই পাওয়া যায়।" ভেনেশীয় বণিক সিজার ফ্রেডারিক ১৫৬৫ সালে এই অঞ্চল পর্যটন করে এখানকার দ্রব্যমূল্যের সুলভতায় বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে পড়েন, তিনি লিখে গেছেন যে, "২ শিলিং ৬ পেন্সে ২টি গরু, একই দামে চারটি শুকর এবং এক পেনিতে একটি মোটা

তাজা মোরগ ক্রয় করা যায়।" এর একশত বৎসর পরে বার্ণিয়ার লিপিবদ্ধ করে গেছেন "যুগ যুগ ধরে এ কথা বলা হয়ে এসেছে যে মিশর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম। কিন্তু দু-দু'বার বঙ্গরাজ্য পর্যটন করে যা দেখেছি এ কথা মিশর অপেক্ষা বঙ্গদেশের ক্ষেত্রেই অধিক প্রযোজ্য।" সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশ ভ্রমণ করে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "এখানে প্রাপ্ত জিনিষ পাওয়া যায় এবং সেগুলি অত্যন্ত সুলভ, এছাড়াও এখানকার সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্র দুনিয়ার কোথাও নেই, চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না, এ এক আশ্চর্য দেশ, এত যুদ্ধ বিদ্রোহ মন্বন্তর মহামারী, অত্যাচার-অরাজকতাও এর সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য হ্রাস পায় নি বরং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রয়েই গেছে"।

সোনারগাঁয়ে ভারতের নানা স্থান থেকে বহু পীর-ফকির এখানে আসেন এবং বসবাস করেন। তাদের মধ্যে পাঁচ পীরের স্মৃতি সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে এখানে। উল্লেখ্য যে, শেরশাহ সোনারগাঁও থেকে সুদূর সিন্ধু মহানদ পর্যন্ত তিন হাজার মাইল দীর্ঘ যে রাজপথটি নির্মাণ করে গিয়েছিলেন "গ্রাণ্ড- ট্রাংক" রোড নামে রাস্তাটি সোনারগাঁয়ের বৈদ্যের বাজার থেকেই তার শুরু হয়েছিল যার চিহ্ন এখনও বর্তমান। সোনারগাঁয়ের আশপাশের ধ্বংসপ্রায় কিছু মসজিদ, মোগড়া পাড়ায় গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের মাজার, গোয়ালদীর মসজিদসহ আরো অনেক ঐতিহাসিক স্থাপত্য নিদর্শন কালের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে এখনো টিকে আছে।

এখানে এখনও ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসের যা কিছু পাওয়া যায় তাও বিক্ষিপ্তভাবে, সঠিক তথ্যাদি কোন ঐতিহাসিকই সংরক্ষণ করে যান নি। তাই অনেক অজানা কথা ও তথ্য বহন করে ঐতিহাসিক সোনারগাঁও বেঁচে থাকবে দেশী বিদেশী সকলের কাছে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তিনি ইতিহাস বিখ্যাত ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের বাংলার রাজধানী এবং এক কালের প্রসিদ্ধ মসলিন বস্ত্রসহ লোক ও কারুশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ সোনারগাঁকে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশনের জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে বেছে নেন। ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্প সংগ্রহ সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন এবং গ্রামীণ বর্তমান কারুশিল্পকে উৎসাহ ও বাঁচানোর প্রয়োজনে ১২ মার্চ ১৯৭৫ সালে সরকার এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন সোনারগাঁয়ে প্রতিষ্ঠা করে। ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ে বাংলার কারুশিল্পের ঐতিহ্যের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশনের প্রথম ট্রাষ্টি বোর্ডের সভা ১লা জুন ১৯৭৫ সালে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহশালা এবং কারুশিল্প গ্রামের জন্য নীতিগতভাবে তিনশত বিঘা জমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা রেখে আপাততঃ একশত পঞ্চাশ বিঘা জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তের আলোকে সর্দার বাড়ী সংলগ্ন ১৫০ বিঘা জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত ফাউণ্ডেশনের যেমনি ধাপে ধাপে কলেবর বেড়েছে তেমনি দেশি বিদেশী দর্শনার্থী/পর্যটকগণেরও ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ে ফাউণ্ডেশনে সমাগম বেড়েছে অনেকগুণ বেশি। ফাউণ্ডেশনের মূল লক্ষ্য ৩টি ধারায় বিদ্যমান, প্রথম লোকশিল্প নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য লোকশিল্প প্রদর্শন, উৎপাদন ও পুনরুজ্জীবিতকরণ। ফাউণ্ডেশনের ১৫০ বিঘা আয়তনের চত্বরে নতুন পুরাতন যাদুঘর ভবন, প্রশাসনিক ভবন, বিক্রয় কেন্দ্র, গ্রন্থাগার, কারুশিল্প গ্রাম, পুকুর, লেক, লিচুবাগান, পেয়ারা বাগান, লেকে নৌকা, গোটা চত্বরে ফল ও ফুলের বাগান ফাউণ্ডেশনের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। প্রতি বছর শীত মৌসুমে লোকজ উৎসব ও কারুশিল্প মেলায় ফাউণ্ডেশন চত্বর হয়ে উঠে এক উৎসব মুখর ও এ ছাড়াও ফাউণ্ডেশন এলাকার উন্মুক্ত পিকনিক স্পট ঘাস কুঞ্জের পার্শ্বে সাজানো গাছগাছালী বা ছাউনীতে অনেকে রান্নার ব্যবস্থা করেছে। সেই অবধি অকৃত্রিম পল্লী গ্রামের নিয়মেই খোলা আকাশের নীচে রান্না হচ্ছে। খাবার পরিবেশন হচ্ছে, কত উৎসাহ উদ্দীপনা এবং প্রাণ চাঞ্চল্যে শিশুরা খেলছে, বয়স্করা আনন্দ ফুর্তি করছেন।

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশনে, লোকশিল্প যাদুঘর, কারুশিল্পগ্রামসহ ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তৎপর। দেশী-বিদেশী দর্শনাথী, পর্যটকগণকে হাতছানি দিয়ে আহ্বান জানাবে বার বার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশনে আসতে এবং সোনারগাঁয়ের অতীত-পরিবেষ্টিত, ফাউণ্ডেশন কেন্দ্রিক বর্তমান সোনারগাঁওকে অবলোকন, উপভোগ করতে। ❑

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের
লোক ও কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৪ এর
কিছু ছবি

"এদেশের একান্ত নিরক্ষর লোকের মুখেও জ্ঞানের অপূর্ব বাণী উচ্চারিত হতে শোনা যেতে পারে। পল্লী পথে হেঁটে যেতে এমন সূক্ষ্ম কারুকার্য অবলোকন করা যেতে পারে যা যুগ যুগান্তরের সাধনালব্ধ। যে গ্রাম্য শিল্পীর হস্ত পাথর কেটে মহাকালের বুকে পদ্মপুষ্প রেখে যেতে পারে সে জাতি শ্রদ্ধার।"

—নৃতাত্ত্বিক ডঃ হটন

"একটি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অতি সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও অঙ্গুলি সংকেত করতে পারে.....দেশবাসী যদি তার গুরুত্ব অনুভব করে এ সম্বন্ধে যত্নবান হন—নিজেকে ও নিজের দেশকে আবিষ্কার করতে বের হন—এক্ষুনি—এই মুহূর্ত থেকে—তবেই দেশে নব্য স্বজাত্যবোধের এক দক্ষিণ বাতাস প্রবাহিত হবে।"

—ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী

".....জাতির সভ্যতা আর সংস্কৃতিকে গড়ে তুলতে হলে লৌকিক সংস্কৃতি দিয়ে করতে হবে ..... লোক ঐতিহ্যের সার্বিক চিত্র আয়নার মতো ধরে রাখার দায়িত্বই হলো বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন স্থাপনের মূল দর্শন।"

—বজলুর রহমান ভূঁইয়া

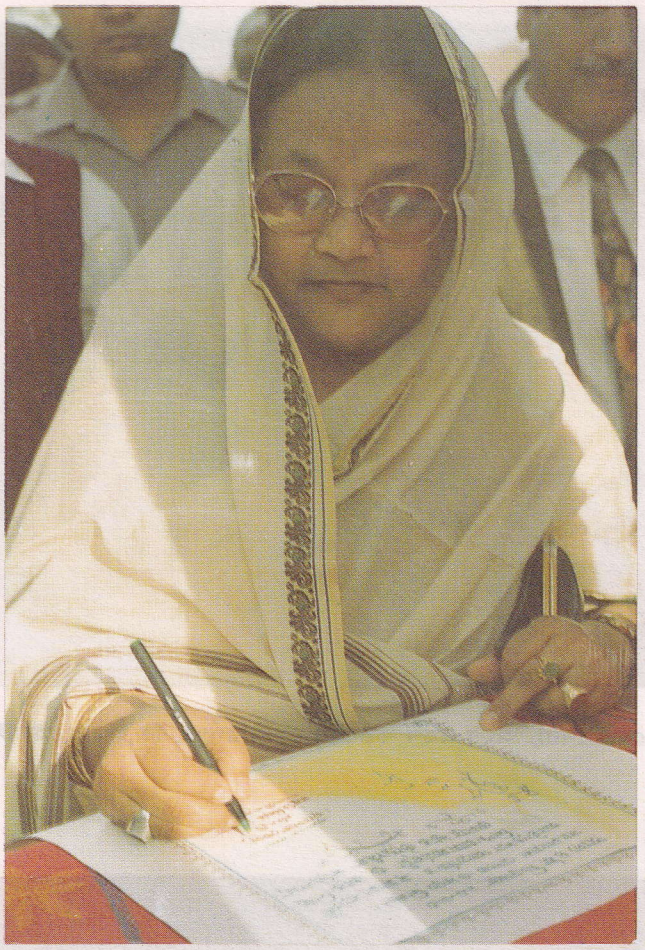

শিল্পগ্রাম কর্মসূচী কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৪ এর শুভ উদ্বোধন করছেন মাননীয়া সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম।

মাননীয়া প্রতিমন্ত্রী প্রদর্শনী মঞ্চের দিকে যাচ্ছেন।

গ্রামীন খেলাধূলা (মেয়েদের), অংশ গ্রহণ করছেন সোনারগাঁও, জি, আর, ইনষ্টিটিউশনের ছাত্রীরা।

লোকজ উৎসব '৯৪ এ বাউল গান পরিবেশন করছেন।

লোকজ উৎসব '৯৪ এ লোকনৃত্য পরিবেশন করছে বনফুল সাংস্কৃতিক দলের দুজন শিশুশিল্পী।

লোকজ উৎসব '৯৪ এ উপজাতীয় নৃত্য পরিবেশনের একটি অংশ।

কারুশিল্প গ্রাম পরিদর্শন করছেন মাননীয়া সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী।

কারুপল্লীতে কাঠের ঘোড়া তৈরি করছেন কারুশিল্পী।

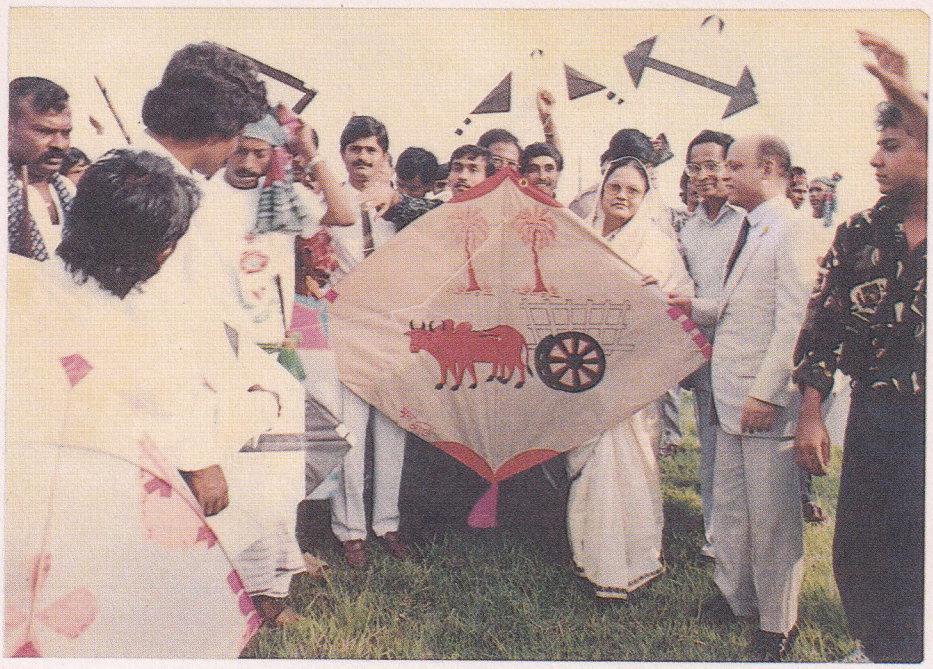

ঘুড়ি প্রদর্শনী উদ্বোধন করছেন মাননীয়া সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী।

লোক মেলায় নকশী পিঠা প্রদর্শিত হচ্ছে।